Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 195-210

করিমপুরের ধর্মচর্চা ও দেশভাগের প্রভাব

উত্তম শর্মা

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, ক্যাটাগরি-১, ইতিহাস বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

নদিয়া জেলার এক সীমান্তবর্তী জনপদ হল করিমপুর। এই জনপদের উত্তরে ও পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা এবং পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থান। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অবিভক্ত নদিয়া জেলা পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল। যথা কৃষ্ণনগর সদর, রানাঘাট, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর। করিমপুর জনপদটি ছিল মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে ভৌগলিক টলেমির মানচিত্রে গঙ্গা নদীর অববাহিকায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপাঞ্চলকে কুস্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর অঞ্চল বলে মনে করা হয়।[১] মেহেরপুর প্রসঙ্গে কুমুদনাথ মল্লিক বলেছেন "কেহ কেহ এই স্থানটিকে মিহির-খনার বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতেই মিহিরপুর, অপভ্রংশে মেহেরপুর কল্পনা।[২] কিন্তু বর্তমান মেহেরপুর জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে গুপ্ত আমলে এই অঞ্চলের কোন ইতিহাস জানা যায়না। উল্লেখ্য যে গঙ্গা অথবা বৃহত্তম কোন জলাময় স্থানের বুকে তিল তিল করে জেগে ওঠে এই উর্বর দ্বীপাঞ্চলে দক্ষিণবঙ্গ থেকে পুণ্ড্র বা পোদ জাতি অথবা পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ জাতির মানুষ চাষাবাদ অথবা মাছ সংগ্রহের আশায় এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে বলে অনুমান করা যায়। তাও সম্ভব হয়েছিল শশাঙ্কের রাজত্বকালে এবং পাল ও সেন আমলেও মেহেরপুরের অস্তিত্ব ছিল।[৩] কিন্তু নির্দিষ্টভাবে করিমপুরের আত্মপ্রকাশ কখন হয়েছিল তা বলা মুশকিল। করিমপুর থেকে মাত্র ৭০ কিমির মধ্যেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থান। তথাপি করিমপুরে শশাঙ্ক বা পাল রাজাদের শাসনকালের প্রত্যক্ষ নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ স্থাননামের উপর গুরুত্ব দিয়ে করিমপুরের সেনপাড়াকে আদিমধ্য যুগীয় সেন শাসনের সাথে একাত্ম করতে চেয়েছেন। গবেষক সুজিত বিশ্বাস তার এম ফিল ডিগ্রির জন্য প্রণীত গবেষণা অভিসন্দর্ভেও এই সম্ভাবনার কথা বলেছেন।[৪] এ প্রসঙ্গে সেনপাড়ার মাঠের মধ্যে অবস্থিত কালীঠাকুরের একটি পুরনো বেদী সংলগ্ন স্থানে কড়ি ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাচীন দ্রব্য প্রাপ্তি,[৫] মধ্যযুগে রানী ভবানীর শাসনকালে সেনপাড়ার নিকটবর্তী দোগাছি গ্রামের এক পুকুর থেকে সেন শৈলীর একটি বিষ্ণু মূর্তি ও একটি সপরিবার দুর্গা মূর্তি প্রাপ্তি,[৬] করিমপুর থেকে মাত্র ৬০ কিমির ব্যবধানে গাছা অঞ্চলে লক্ষণ দিঘির অবস্থান[৭] মাত্র ১০০ কিমির ব্যবধানে সেন রাজধানী নবদ্বীপের অস্তিত্ব, করিমপুর থেকে কুষ্টিয়া হয়ে সেনদের অপর রাজধানী বিক্রমপুরের যাওয়ার সুবিধা, সেনপাড়ার প্রাচীন ব্রাহ্মণ জমিদারদের

সেন পদবি[৮] প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তথাপি একথা সত্য যে করিমপুরে সেন শাসন সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ তথ্যের প্রাচুর্য নেই। সেন পাড়ার সেন জমিদারদের সাথে আদিমধ্য যুগের সেন শাসকদের সাথে সম্পর্ক ছিল কিনা তাও জানা যায়না। তাই এই অঞ্চলে সেন শাসনের অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা বলা মুশকিল, আবার তা যদি থাকেও তা ছিল অতি ক্ষীণ ধারায়। বস্তুত মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলেই পার্শ্ববর্তী মানুষদের আগমন ও বসতি স্থাপনের উপর ভিত্তি করে করিমপুরের সমাজ ও ধর্মীয় জীবন সুগঠিত হয়েছিল। অতঃপর ভক্তিধর্মের বিস্তার, মুঘল যুগে বারোভুঁইয়াদের সাথে সম্রাটের দ্বন্দ্ব, ব্রিটিশ শাসন ও নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম, সর্বোপরি দেশভাগের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে এই জনপদের ধর্মচর্চা। এছাড়া বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, বৈবাহিক ও কর্মসুত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে করিমপুরের যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছে তার প্রভাবেও প্রভাবিত হয়েছে করিমপুরের ধর্মীয় কাঠামো। এই কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল বাঙালি ও মাড়োয়ারি হিন্দুদের ধর্ম উপাসনা, ইসলাম ধর্মের চর্চা, জৈন ধর্মের উপাসনা, খ্রিস্টান ধর্মচর্চা, আদিবাসীদের উপাসনা এবং কিছু লৌকিক ধর্মচর্চা।

সূচনা থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত করিমপুরের ধর্মীয় জীবনঃ

হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যঃ

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে করিমপুরের বিভিন্ন অঞ্চল সুগঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হোগলবেড়িয়া, সুন্দলপুর, মুরুটিয়া, কেচুয়াডাঙ্গা, কুচাইডাঙ্গা, পাট্টাবুকা, ধোড়াদহ প্রভৃতি। সেইসময় করিমপুরের সংখ্যাগুরু অধিবাসী ছিল মুসলমানরা। এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ছিলেন সম্ভ্রান্তশালী, অধিকাংশই ছিল দরিদ্র এবং হিন্দু প্রভুর মুখাপেক্ষী। তাই সমাজের প্রাধান্য ছিল তুলনামূলকভাবে সম্পদশালী ও প্রভাবশালী হিন্দুদের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে হিন্দু ধর্মাচরণই দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। এপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বাগচী তার ‘পল্লি-কথা প্রবন্ধে লিখেছেন- এই অঞ্চলে দুর্গোৎসবই ছিল প্রধান। এছাড়া কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিবপূজা, দোল, চড়ক, রথযাত্রা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য থাকায় আমিষ আহারের খুব বাড়াবাড়ি ছিলনা। এই অঞ্চলে ফাল্গুন মাসের শেষ তিনদিন ঠকঠকে নামক একপ্রকার উৎসব হত। এটি মূলত ওলাবিবি বা ওলাওঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সন্তুষ্ট রাখার ব্রত। এই উৎসবে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং সংগীত পরিবেশিত হয়। মুসলমানরা ওলাবিবির উপাসনার সময় ছাগল বলি দিত। এখানকার চণ্ডালরা চৈত্র সংক্রান্তির সময় একটি অনুষ্ঠান করত। তাতে তারা পায়ে নুপুর বেঁধে কৃষ্ণ বিষয়ক সুলান বা ছল গেয়ে বেড়াত। বৈশাখ মাসে পালিত হত পুণ্যপুকুর নামক একটি উৎসব।[৯] এছাড়া ইতুপূজা, ষষ্ঠীর ব্রত, শিতলা পূজা, ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

আলোচ্য কালপর্বে মন্দির স্থাপন করেও হিন্দু উপাসনার দৃষ্টান্ত বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য যে মধ্যযুগ থেকে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত করিমপুরের উল্লেখযোগ্য মন্দির, উৎসব ও পুজাগুলি হল–

(১) মেহেরপুরের মুখার্জী জমিদাররা মুরুটিয়া গ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারু বিগ্রহ স্থাপন করেন। জনশ্রুতি আছে যে মধ্যযুগের অন্যতম ভক্তি সাধক শ্রী চৈতন্যদেব শ্রীহট্ট যাত্রাকালে এই মন্দিরে রাত্রিবাস করেছিলেন। এই মন্দিরে স্নানযাত্রা উপলক্ষে ১১ দিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই যোগদান করেন।[১০] (২) করিমপুরের হিন্দু ধর্মচর্চার দৃষ্টান্ত হল- কলাবেড়িয়ার মদন মোহন মন্দিরের ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান,[১১] (৩) হোগলবেড়িয়ার নস্করি দুর্গার পূজা, (৪) ধোড়াদহের চৌধুরীদের বুড়িমায়ের পূজা, (৫) পাট্টাবুকার ঘটক বাড়ির কালীপূজা, (৬) নাটোরের জমিদার রানী ভবানি কর্তৃক দোগাছিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী রাজবল্লভী মন্দির এবং (৭) গোপালের পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দির, (৮) ধোড়াদহের চৌধুরী বাড়ির ছোট মায়ের মন্দির, (৯) ধোড়াদহ সাহা পাড়ার দুর্গা পুজা, (১০) ধোড়াদহের রামনবমীর মেলা, (১১) কেচুয়াডাঙ্গার সিদ্ধেশ্বরী মেলা,[১২] (১২) ফুলখালি গ্রামের বারুনি স্নানের মেলা,[১৩] (১৩) সুন্দলপুরের দোলবাড়ির শ্রী শ্রী বৃন্দাবন বিহারীর পূজা ও দোল উৎসব,[১৪] (১৪) সুন্দলপুরের বাবু পাড়ায় কার্তিক চন্দ্র বাগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চারচালা যুক্ত দুটি শিব মন্দির,[১৫] (১৫) সুন্দলপুর মৈত্র পাড়ায় গঙ্গারাম মৈত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দির ও সেখানে স্থাপিত জোড়া শিবলিঙ্গ,[১৬] (১৬) ১১২৬ বঙ্গাব্দে সুন্দলপুরের বাগপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত বুড়িমা মন্দিরের দুর্গা পুজা,[১৭] (১৭) ১২৬২ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদের ভগীরথপুরের জমিদার সাহা বাবুদের আর্থিক সাহায্যে হরিপুরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরাই মন্দির,[১৮] (১৮) ১৮৩৬ সালে শম্ভুনাথ মিত্র কর্তৃক খানপুরে প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিব মন্দির,[১৯] (১৯) দিঘলকান্দির শিব মন্দির প্রভৃতি।

মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যঃ

প্রাক স্বাধীন করিমপুরের মুসলমানদের মধ্যে কুচাইডাঙ্গার মুসলমানরা ব্যাতিত অধিকাংশই ছিলেন নম্র ও শান্ত প্রকৃতির। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে ব্যতিক্রম দুয়েকজন ব্যতিত সকলেই ছিলেন দরিদ্র এবং হিন্দু প্রভুর অধীনস্থ ও হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পল্লীকথা প্রবন্ধে[২০] বলা হয়েছে যে এই সময়- (১) মুসলমানরাও দূর্গা পূজা উপলক্ষে নববস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আনন্দ করত (২) সত্যপীরের পূজা করত (৩) অম্বুবাচি ও ষষ্ঠী উদযাপন করত (৪) সরস্বতী পূজায় অংশ নিত (৫) মনসা কেন্দ্রীক ধর্ম বিশ্বাসে আস্থা জ্ঞাপন করত। আবার মহরমের শোভাযাত্রা, ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতি পালন করত। মসজিদ নির্মান করে নামাজ পাঠেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। রহমতপুরের মৌলানা ইসহাক, ফাজিলনগরের মৌলবি মনিরুদ্দিন প্রমুখ ছিলেন নদিয়া জেলার মধ্যে নামজাদা মৌলবিদের মধ্যে অন্যতম। যদিও এখানে মসজিদের সংখ্যা ছিল

নগন্য, যেগুলি ছিল সেগুলিতেও দারিদ্রের ছাপ ছিল স্পষ্ট। এই কালপর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ হল- (১) মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত কেচুয়াডাঙ্গার মসজিদ, উল্লেখ্য যে এই মসজিদটি হলো নদিয়া জেলার প্রাচীনতম মসজিদ[২১] (২) ১৭৮৭ -১৭৮৮ সালে ভূমিপুত্র ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ কুদরতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দোগাছির বড় মসজিদ[২২] (৩) রহমতপুরের মসজিদ (৪)১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সবজি ব্যবসায়ী সাদেক মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত থানারপাড়ার সবজি মসজিদ। এছাড়া কুচাইডাঙ্গা, কাছারিপাড়া, পাট্টাবুকার মসজিদ ছিল অন্যতম।[২৩]

পীরবাদী উপাসনাঃ

বাংলায় ইসলামের প্রবেশের সাথে সাথেই সুফীবাদি সাধকদের আগমন ঘটে। তাদের প্রভাবে লৌকিক ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[২৪] এই লৌকিক ইসলামের ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল পীরের উপাসনার মধ্য দিয়ে। উল্লেখ্য যে পীর হলেন মূলত মুসলমান ধর্মাবলম্বী ধর্মগুরু। তিনি এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত রূপ হয়ে উঠতেন। তার কাছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই আসতেন। করিমপুর অঞ্চলেও পীরবাদের উপাসনা গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে- (ক) পারস্য থেকে আগত পীর শাহওলিদ দোগাছির বড় মসজিদের পাশে মাজার গড়ে তুলেছিলেন[২৫] (খ) থানারপাড়ায় জঙ্গলী পীরের মাজার ছিল। সেখানে মেলাও বসত[২৬] (গ) কেচুয়াডাঙ্গার পীরতলায় একজন জঙ্গলী পীরের অবস্থান ছিল। সেখানে তার মাজার অবস্থিত[২৭] (ঘ) দিঘলকান্দিতে পীরের মাজার ও তার উপাসনার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

খৃস্টান ধর্মচর্চাঃ

ব্রিটিশ শাসনকালে করিমপুরের উর্বর জমিতে নীল চাষের জন্য নীলকর সাহেবদের ব্যাপক আগমন ঘটে। কালক্রমে শিকারপুর, বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানে গড়ে ওঠে নীলকুঠি। উলেখ্য যে শিকারপুর ছিল ১৫২টি নীলকুঠির প্রধান কার্যালয়। এখানে এখনও সেই কুঠির সামান্য ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব রয়েছে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী নীলকর সাহেবরা নিজেদের ধর্মাচরনের জন্য শিকারপুরের নিকটবর্তী শান্তিরাজপুরে গির্জা নির্মান করেন এবং এই অঞ্চলে খ্রিষ্টান ধর্ম বিস্তারের চেষ্টা করে।[২৮] উল্লেখ্য যে ১৮৮৪ খ্রিঃ নাগাদ রবার্ট ডাডলে স্মিথ ও তার দুই বন্ধু মিলে এই চার্চ প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। এর সাথেই তৈরি হয় একটি একটি প্রাইমারী স্কুল, ডিসপেন্সারি প্রভৃতি।[২৯] এই চার্চের প্রথম মিশনারি হয়ে আসেন রেভারেণ্ড সি.এইচ. গিল (১৮৮৬-১৮৯০)।[৩০]

আদিবাসী ধর্মঃ

রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও খাদ্যের যোগান এবং

শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বহু আদিবাসী করিমপুর অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এছাড়া ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহের পর সাহেবরা নীলচাষ, নীলকুঠিতে কাজের জন্য রাজমহল সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের করিমপুরে নিয়ে আসে।[৩১] শিকারপুরের দহখুলা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে এই সকল আদিবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এরা এদের মহল্লায় শুরু করে নিজেদের মত করে টুসু পূজা সহ বিভিন্ন পরবের চর্চা।

গৌণধর্ম চর্চাঃ

করিমপুরের ধর্মীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গৌণ ধর্মের চর্চা। উল্লেখ্য যে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী করিমপুরে খুব সহজেই লালনশাহী ধর্মের প্রবেশ ঘটে। এর পাশাপাশি এখানে সহজিয়া বৈষ্ণব ও কর্তাভজাদেরও ধর্মীয় ভাবনা প্রচলিত ছিল। অবশ্য এখানে সব গৌন ধর্মগুলিই বাউল নামে একাকার হয়ে গেছে। শক্তিনাথ ঝা-র ‘বস্তুবাদী বাউল গ্রন্থ[৩২] থকে এই সময়কালের কয়েকজন বাউলসাধকের নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন শিকারপুরের আমানত গায়েন ও কালাচাঁদ ফকির, গোড়ভাঙ্গার আজাহার ফকির, বালিয়াডাঙ্গার রাজ ক্ষ্যাপা, নারায়ন পুরের ফরিদ বিশ্বাস প্রমুখ।

দেশভাগের প্রভাবঃ

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগ করিমপুরের জনজীবনকে ব্যাপক প্রভাবিত করে। উল্লেখ্য যে ৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের ঘোষনায় করিমপুর অঞ্চল পড়েছিল পাকিস্তানের মধ্যে। কিন্তু ১৭ই আগষ্টে 61 G.A. dated 17/08/1947 u/s 4(1) of CR.P.C1898 অর্ডার অনুযায়ী করিমপুর থানা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮ই আগষ্ট এখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। তারপর থেকে দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে চলেছিল পূর্বপাকিস্তান থেকে করিমপুরে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমন প্রক্রিয়া। আর সামান্য পরিমান মুসলমান জনগোষ্ঠির দেশান্তর গমন। অবশ্য এসবের ফলে রহমতপুরের মসজিদটি পরিত্যক্ত হওয়া ছাড়া ইসলামে ধর্মচর্চায় কোনও প্রভাব পড়েনি। কারন এপার থেকে মুসলমানদের অভিগমনের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগন্য। তাছাড়া বহু মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েও অনিশ্চিৎ জীবিকার আশঙ্কায় পুনরায় ফিরে এসেছে করিমপুরেই। তারপরে পুনঃনির্মাণ করেছে নিজেদের উপাসনালয়।[৩৩] কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় উপাসনা, ও আদিবাসীদের উপাসনা হয়েছে অনেক বেশি বিস্তৃত। কারণ দেশভাগের অভিঘাতে পূর্বপাকিস্তান থেকে আগতদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন বাঙালি হিন্দু, মাড়োয়ারি হিন্দু ও বিহারী হিন্দু, এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাঙালি হিন্দুরা এদেশে এসে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় লাভের পাশাপাশি বিভিন্ন কলোনি গড়ে তোলে। এরই ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে আনন্দনগর কলোনি, হঠাৎ কলোনি, সুকান্ত কলোনি প্রভৃতি। অনেকে নিজেদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বা পাড়ায় আশ্রয় নেয়। অনেকে আবার বিনিময় করা

বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন। জন্মভূমি ছেড়ে আসার সময় এই সকল মানুষের প্রধান সম্বল ছিল নিজেদের ধর্মীয় আস্থা, ধর্মীয় প্রতীক, নারায়ণ শিলা, ঠাকুর-দেবতার প্রতিকৃতি, ও ধর্মীয় ঐতিহ্য। এদেশে কিছুকাল বসবাসের পর তারা এখানেই সেই সকল ঐতিহ্যের প্রচলন করেন। এর ফলে করিমপুর অঞ্চলে অনেকগুলি ধর্মীয় উৎসব, মেলা, ও লৌকিক ধর্মাচরণের প্রচলন হয়। যেমন-

তকিপুরের বুড়ো শিব পূজা

দেশ ভাগের পর করিমপুরের তকিপুর গ্রামের সামাজিক অবস্থা তথা জনবিন্যাসে আমূল পরিবর্তন আসে। একদা মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের অধিকাংশ পাড়ি দেয় পূর্ব পাকিস্তানে আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমনে এই অঞ্চল হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু হিন্দুদের বসতি। এই গ্রামে আগত বেশিরভাগই হলো মাহিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত এবং অধিকাংশই কুষ্টিয়া জেলার গোয়াল গ্রামের অধিবাসী। বেশকিছুকাল অতিবাহিত করার পর তারা তাদের নতুন বসতিতে শুরু করেন পূর্বতন বাসভূমিতে পালিত বুড়ো-শিবের পূজা। উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে গোয়াল গ্রামের বিখ্যাত ব্রাহ্মন পুরোহিত হরিনারায়ন চক্রবর্তী করিমপুরের ভৈরব নদী তীরবর্তী নাটনা গ্রামের ব্রাহ্মন গঙ্গানারায়ন অধিকারীকে একটি পাথরের শিবলিঙ্গ প্রদান করেছিলেন নিত্য সেবার জন্য। সেই শিবলিঙ্গটিকে তকিপুরে বুড়োশিব রূপে পূজা করা হয়।

গঙ্গানারায়ন অধিকারীর শিবলিঙ্গ প্রাপ্তি থেকে তকিপুরে এই পূজার সূচনা নিয়ে বেশ কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যেমন – নাটনা গ্রামের ক্ষুদু ঠাকুরের ঠাকুর্দা (গঙ্গানারায়ন অধিকারী) স্বপ্নাদেশ পান যে গোয়াল গ্রামের ‘বুড়ো-শিব লিঙ্গ-রূপে ভৈরব নদীতে ভেসে আসছেন। তিনি যেন তাঁকে গ্রহন করেন। পর দিন ভৈরব নদীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যিই তিনি একটি শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন। সেটি নিজ বাড়িতে এনে যত্ন সহকারে প্রতিষ্ঠা করেন। এর কয়েকদিন পরেই গোয়াল গ্রাম থেকে আগত টকিপুরের বাসিন্দা রামপদ মণ্ডল ও তার ভাই শঙ্কর মণ্ডল স্বপ্নাদেশ পান যে নাটনার ঠাকুর বাড়িতে তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের বুড়ো শিব লিঙ্গ রূপে অবস্থান করছেন তাকে যেন গোয়াল গ্রামবাসীদের নতুন বাসভূমিতেও পূজা করা হয়। তারপর থেকে এই গ্রামে বুড়ো শিবের পূজার প্রচলন হয়। এর ফলে করিমপুরে ধর্মীয় সংস্কৃতিতে নতুন ধর্মাচরণের সংযোজন ঘটে।

অভয়পুরের ব্রহ্মা পূজা ও মেলা

অবিভক্ত নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার দৌলতপুর থানার শেহালা গ্রামে আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে ব্রহ্মা পূজার সূচনা হয়। কথিত আছে যে শেহালা গ্রামের ধনী গৃহস্থ যাদব চন্দ্র মণ্ডলের গোলা বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল রকম চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা করেন। আগুন নিভে যাওয়ার পর

দেখা যায় আগুন ঝাঁপি (কাদা মাটির প্রলেপ লাগানো দেওয়াল ও দরজা) অতিক্রম করে অগ্নিকাণ্ড গোলা বাড়িকে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেনি। যাইহোক এই ঘটনার পর তিনি নিজ গৃহে ব্রহ্মা পূজার সূচনা করেন। কিছুকাল পর গ্রামের মানুষরা এই পূজায় আত্মনিয়োগের আবেদন জানালে এই পারিবারিক পূজা ক্রমেই সর্বজনীন পূজায় পরিণত হয় ও পূজাকে কেন্দ্র করে অষ্টপ্রহর লীলা কীর্তন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। দেশভাগের পর যাদব চন্দ্র মণ্ডলের পুত্র কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল (কোম্পানি সরকার এদের বিশ্বাস পদবি দিয়েছিলেন) এর পরিবার সহ শেহালা গ্রামের বহু পরিবার করিমপুরে চলে আসেন। এই পরিবার গুলির মধ্যে ব্রহ্মা মূর্তি নির্মানকারী মালাকার ও পূজারী ব্রাহ্মণের পরিবারও ছিল। যাইহোক এদের অধিকাংশ আশ্রয় পান অভয়পুর গ্রামে। পরের বছর তাদের একদল প্রতিনিধি শেহালা গ্রামে গিয়ে সেই ব্রহ্মা তলার মাটি নিয়ে আসেন। হাওড়ার শালকিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাম অবতার চট্টোপাধ্যায়ের একটি বাগান বাড়ি ছিল অভয়পুরের তীরবর্তী খড়ে নদীর ধার দিয়ে অবস্থিত বিস্তির্ণ ভূখণ্ড জুড়ে। তাঁর কাছ থেকে দশ শতক জমি চেয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হল শেহালা গ্রাম থেকে আনা ব্রহ্মা মন্দিরের মাটি। সেখানে কাঁচা ঘর নির্মাণ করে শুরু হলো ব্রহ্মা পূজা। শেহালা গ্রামে যে মালাকার মূর্তি নির্মাণ করতেন তিনিই একই ধাঁচে মূর্তি বানালেন। এই মূর্তি হল এক কাঠামোর মূর্তি। একই কাঠামোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অগ্নি মূর্তি নির্মিত হয়। শেহালা গ্রামের পুরোহিতই পূর্বতন রীতিতেই পূজার সূচনা করলেন। বেশকিছু কাল পুরো গ্রামের মানুষ সর্বজনীন ভাবে এই পূজা চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯৭৮-১৯৭৯ সাল নাগাদ এই পূজার উপর পড়ে গ্রাম্য রাজনৈতিক বিবাদের প্রভাব। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে পুলিশি প্রহরায় একই মন্দিরে দুটি মূর্তি স্থাপন করে পূজা পরিচালিত হয়। পরের বছর সভা করে স্থির হয় যে দুই গোষ্ঠী আলাদা আলাদা স্থানে পূজা করবে এবং আদি স্থানে কেউই পূজা করতে পারবেনা। শেষ পর্যন্ত এক দল ওই মন্দিরের একটু সামনে নতুন মন্দির স্থাপন করে পূজা করতে থাকেন আর অপর গোষ্ঠি ওই মন্দির থেকে প্রায় ১০০ মিটারে দূরে আরেকটি মন্দির স্থাপন করে ব্রহ্মা পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন।[৩৪]

আনন্দনগর কলোনির কদমা মেলা

দেশভাগের ফলশ্রুতিতে শুরু হওয়া একটি গ্রামীণ ধর্মীয় মেলা হল আনন্দনগর কলোনির কদমা মেলা। উল্লেখ্য যে আনন্দনগর কলোনিতে বিভিন্ন স্থানের মানুষ থাকলেও এখানকার বেশিরভাগ ও নেতৃস্থানীয়রা মাগুড়া জেলা থেকে আগত এবং ধীবর ও নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের। তারা এই কলোনিতে বেশ কিছুকাল অবস্থানের ভিত্তিতে নিজেদের ভিতকে সুদৃঢ় করার পর মহল্লার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই তারা স্থান দেন তাদের ফেলে আসা ঐতিহ্যকে। এরই ফলশ্রুতিতে শুরু হয় কদমা মেলা। কদমা মেলা আসলে রক্ষাকালীর পূজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলা। এই উৎসবের অভিনবত্ব হলো রক্ষা কালীর মূর্তির

ডান দিকে পূজীত হন লক্ষ্মীর পট আর বাঁ দিকে পূজীত হন দেবী মনসা। সম্ভবত এর পশ্চাতে সমৃদ্ধি কামনা এবং সাপ ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভের বাসনাও কাজ করেছে। অন্যদিকে এই মেলার বিশেষ আকর্ষন হলো বিচিত্র ধরনের ও বিশালাকার কদমার সম্ভার যুক্ত দোকান। মেলার বিকিকিনির প্রধান উপাদান এই কদমা। সেই আদি কাল থেকে এই মেলার এই বিশেষত্ব মোটামুটি অক্ষুন্ন রয়েছে।[৩৫]

নাসিরের পাড়ার গঙ্গা মেলা

অবিভক্ত নদিয়ার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কাগমারির চর, বৈরাগীর চর প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা রাইটার নদীকে কেন্দ্র করে গঙ্গা পূজা করত। দেশভাগের পর বৈরাগীর চরের অধিবাসীরা নাসিরের পাড়ায় আশ্রয় লাভ করেন। তারপর থেকে পুরনো ঐতিহ্য মেনে গঙ্গা পূজার মেলা শুরু করে। শুধু পাল্টে যায় নদী-তট। আগে যা রাইটার নদীর তীরে হত দেশভাগের পর তারা জলঙ্গী নদীর তীরে তা করতে শুরু করে।[৩৬]

ভিটেকুমারী পূজা

পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা থেকে আগত মূলত ধীবর ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষদের মাধ্যমে করিমপুরে প্রচলিত হয় ভিটেকুমারী পূজা। পূজা উপলক্ষে ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে তুলসী তলায় কাদা মাটির বেদী তৈরী করা হয়। তার শীর্ষদেশে পোঁতা হয় একটি কুল সহ কাঁটা যুক্ত ছোট ডাল। মাসের প্রথম ও শেষ দিন বিশেষ আয়োজন করে পূজা হয়। বাকি দিন গুলিতে সন্ধ্যা বেলায় ধূপ দীপ প্রজ্জ্বলন করে পুষ্প সহ প্রার্থনা করা হয়। এই পূজায় যে সব ফুল আবশ্যক সেগুলি হল ভাট ফুল, মান্দার ফুল প্রভৃতি। এই পূজার মন্ত্র হল যুগ যুগ ধরে প্রচলিত গান। সেগুলি প্রতিদিন পূজা উদযাপনকারীরা খালি গলায় সুর করে আবৃত্তি করেন। এমনই একটি গান হল –

“ভিটে কুমারীর মা লো ভিটে বাইন্দে দে
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবি সাইজনে আইনে দে
সাইজনে আনতি গেলরে বুড়ি পথে পইলো খেওয়া
সেই খেওয়া ধুয়ে গেল চৈতনপুরীর দেওয়া
চৈতন পুরীর দেওয়ারে ভাই ঘন ঘন ডাক
আঁইড়ে কুঁইড়ে বাইঁড়ের বেটা কুমোরখালির বর
বরেরা বরেরা কী কী আইনেচে
আর কিছুই আনেনি মেয়ের নাকের নথ
মেয়ে বড় দজ্জাল টাইন দে ফ্যালেচে
জামাই ব্যাটা রসিকি খুঁইটে তোলেচে।”

বস্তুত এর মধ্য দিয়ে নদী নির্ভর নিম্নবর্গীয় জনসমাজের জীবনগাথা ফুটে ওঠে আর এই গাথাই হয়ে ওঠে তাদের ধর্ম ও বিনোদন- দুইই নিবারনের মাধ্যম। বলা বাহুল্য যে এই পূজার সাথে এই অঞ্চলে বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত বসন্তবুড়ির পূজার সাদৃশ্য আছে।

মাড়োয়ারিদের অবদানঃ জগৎ জননী মন্দির থেকে দেবালয় এবং হনুমান মন্দির ও তাদের নিজস্ব রীতিনীতিঃ-

করিমপুরের ধর্মীয় জীবনে মাড়োয়ারিদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অঞ্চলে আগত প্রথম মাড়োয়ারি হলেন রামজীবন পণ্ডিত। তিনি মুলত কলকাতার ইংরেজ চটকলের পাট পার্চেজার হিসেবে করিমপুরে আসেন। এই অঞ্চলের উন্নত পাট এবং পাট ব্যবসায় অধিক মুনাফা লক্ষ করে কিছুকাল পর চাকরি ত্যাগ করে নিজের ব্যবসা শুরু করেন এবং করিমপুরের খড়ে নদীর তীরে বাগচি বাবুদের একটি বাড়ি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৩৭] ১৯৪৪ সাল নাগাদ ভেড়ামারার দূর্গা মন্দিরের পুরোহিত শান্তিরাম ভট্টাচার্য তাঁর শিষ্য বিশ্বনাথ আগরওয়ালাকে সাথে নিয়ে করিমপুরে চলে আসেন। সাথে আনেন ভেড়ামারা মন্দিরের দেবী মূর্তি। কেচুয়াডাঙ্গার দত্ত বাবুরা করিমপুরের খড়ে নদীর তীরে একটি পাকা ঘর সহ বেশ খানিকটা জমি দান করলেন ভেড়ামারার মায়ের উদ্দেশ্যে। সেই ঘরে দেবী প্রতিমা ও নিজ পরিবার নিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন শান্তিরাম ভট্টাচার্য আর বিশ্বনাথ বাবুরা বাসা ভাড়া নিয়ে উঠলেন রামজীবন পণ্ডিতের বাড়িতে। সেখান থেকেই শুরু করলেন পাটের ব্যবসা এবং সেখান থেকেই চালাতে লাগলেন গুরু শান্তিরাম ভট্টাচার্যের ভরণ পোষন ও দেবী মায়ের পূজার ব্যবস্থা। ১৯৫৬-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বনাথ আগরওয়ালা নিজ ব্যায়ে তৈরী করলেন জগৎজননী মন্দির। সেখানেই কাঠের আলমারিতে প্রতির্ষ্ঠিত হন ভেড়ামারা থেকে আনা দেবী প্রতিমার মুখ-মূর্তী। কালক্রমে নাটমন্দির তৈরী হয়। নাট মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত হন দুই পাশে সিংহ সহ ভারত মাতার মূর্তি। এরপরে তৈরী হয় শিব মন্দির। এই মন্দিরেই দেবী শিতলা, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি পূজিত হয়। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বনাথ আগরওয়ালার পুত্র সন্তোষ আগরওয়ালা গুরু শান্তিরাম ভট্টাচার্যের নির্দেশ বারাণসী থেকে ১৬০০০ টাকা ব্যায়ে অষ্টধাতুর সপরিবার দূর্গা মূর্তি নিয়ে আসেন। সেটিও কাঠের আলমারিতে প্রতির্ষ্ঠিত হন। এখানে নিত্য পূজা হয়, পূজার ব্যয়ভার বহন করেন সন্তোষ আগরওয়ালার পরিবার। এছাড়া বৃহদাকার মাটির মূর্তি গড়ে শারদীয়া দূর্গা পূজা, পৌষ কালী পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।[৩৮]

দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের ভেড়ামারা, গোয়ালিয়া এবং মেহেরপুরে ব্যবসারত মাড়োয়ারিদের একটি বিরাট অংশ করিমপুরে চলে আসেন। এর পশ্চাতে অবশ্যই একটা বড় কারন ছিল এখানকার উন্নত পাট ও পাট ব্যবসায় মুনাফার হাতছানি। মাড়োয়ারিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর

১৯৫২-৫৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ করিমপুরে প্রতিষ্ঠিত হল 'মাড়োয়ারি সমাজ। এই সমাজের অন্যতম মুখ ছিলেন হরিপ্রসাদ পাডিয়া। ১৯৬২ সালে তারা নিজেদের মত করে ধর্মাচরণ তথা ধর্মীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। অতঃপর করিমপুরের স্থানীয় ব্যবসায়ী অধীর চৌধুরীর দানকৃত জমির উপর দীননাথ আগরওয়ালা, পঞ্চানন আগরওয়ালা, বাসুদেব আগরওয়ালা ও সত্যনারায়ন আগরওয়ালা- এই চার ভাই নিজ ব্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেন করিমপুর দেবালয় নামক রাধাকৃষ্ণের মন্দির। মাড়োয়ারি সমাজের যাবতীয় ধর্মীয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় এই মন্দির থেকে। সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত প্রধান দরজার পর আঙ্গিনা পেরিয়ে শুরু হয় নাট মণ্ডপ। এর দেওয়ালে বিভিন্ন ধর্ম সাধকদের বাণী খোদিত। বলা বাহুল্য যে অধিকাংশই অবাঙালি ধর্মগুরুদের বাণী সেখানে স্থান পেয়েছে। নাটমণ্ডপ সংলগ্ন একটি বর্গাকার কক্ষের ডান দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হনুমান মূর্তি এবং বামদিকের কুলুঙ্গিতে গড়ুর মূর্তি পূজিত হন। এই কক্ষেরই মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি অষ্টকোণ গর্ভগৃহ। এখানে শ্বেত পাথরের রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এই গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করে রয়েছে প্রদক্ষিণ পথ। করিমপুরের এই মন্দিরেই প্রথম গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা হয়। এই মূল মন্দিরের ডান পাশের একটি স্বতন্ত্র মন্দিরে শিব ও আরো কয়েকজন দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। মাড়োয়ারি সমাজ নিজেদের মত করে ধর্মাচরণের জন্য একটি হনুমান মন্দির নির্মাণ করেছেন। এই মন্দিরের গর্ভ গৃহে হিন্দি ভাষায় লেখা আছে স্বর্গীয় গিরিধারী লাল রুংটা এবং স্বর্গীয় সীতা দেবী রুংটা দ্বারা স্থাপিত। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কুলুঙ্গি আসনে হনুমান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আর মেঝের মাঝখানে শিবলিঙ্গ ও গণেশ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। রয়েছে রাম-লক্ষণ-সীতার প্রতিকৃতিও। এইসব মন্দিরে মাড়োয়ারি ব্রাহ্মণরাই সেবাইতের কাজ করেন। যদিও এইসব মন্দিরে বাঙালিদেরও আনাগোনা শুরু হয় এবং এগুলি হয়ে ওঠে করিমপুরের ধর্মচর্চার অন্যতম পীঠস্থান।[৩৯]

করিমপুরের মাড়োয়ারিদের মধ্যে রয়েছেন এক ঘর জৈন। তারা কয়েক পুরুষ আগে পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহতে বসবাস করতেন। দেশভাগের অভিঘাতে তারা রাজস্থানে ফিরে যান। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পাট ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়ে রাজস্থান থেকে এই গ্রামে আসেন।[৪০] এই পরিবারটি মূলত শ্বেতাম্বর জৈন ধর্মাবলম্বী। পারিবারিক দিক থেকে তারা জৈন রীতি নীতি পালনের পাশাপাশি স্থানীয় মাড়োয়ারি হিন্দুদের সাথে একাত্ম হয়ে থাকেন এবং হিন্দুদের প্রতিটি ধর্মানুষ্ঠানে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই জৈন ধর্মাচার করিমপুরের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। করিমপুরের মাড়োয়ারি জনগোষ্ঠী কোথাও প্রত্যক্ষভাবে মন্দির স্থাপন করেছে আবার কোথাও পরোক্ষ ভাবে সযোগিতা করেছে। তাদের প্রত্যক্ষ অবদানে প্রতিষ্ঠিত দুটি মন্দির হল অভয়পুরের কালী মন্দির এবং বাজিতপুরের মনসা মন্দির। তাছাড়া বাসুদেব বাবুর প্রাঙ্গনে প্রায় ৪৫ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয় নামযজ্ঞ। এর পাশাপাশি মাড়োয়ারি সমাজের স্ত্রী আচার, বা বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান

যেমন কড়বা চৌথ, আমলা নবমী, গোপাষ্টমী, বরকুল্লা প্রভৃতি পালিত হয়। কিন্তু সেগুলি একান্তই তাদের সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সেগুলি মাড়োয়ারি সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র করিমপুরবাসীর ধর্মীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। তবে হোলি উৎসব উপলক্ষে তারা যে হোলিকা দহন করে তা সকল করিমপুরবাসী উপভোগ করে।[৪১]

বিহারী ও উত্তরপ্রদেশী হিন্দুদের অবস্থান

করিমপুরের জনসমাজের সামান্যতম অংশ হল বিহার ও উত্তরপ্রদেশী কয়েকটি হিন্দু পরিবার। এই পরিবারগুলির মধ্যে কয়েকটি পরিবার এসেছে দেশভাগের অভিঘাতে পূর্ব পাকিস্তানের ভেড়ামারা থেকে। সেখানে তারা পূজারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েকটি পরিবার এসেছে সরাসরি বিহার, ইউ.পি ও কলকাতা থেকে করিমপুর হাসপাতাল, কলেজ, সিনেমা হল প্রভৃতি স্থানে সাফাইকর্মী হিসেবে। এরা হেলা সম্প্রদায়ের। এই জনবসতির অবস্থানের ফলে করিমপুরের ধর্মীয় অঙ্গন যথেষ্ট স্ফীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে হেলা সম্প্রদায়ের হাত ধরে করিমপুরে ছট পূজার প্রচলন হয়। অন্যদিকে বিহারী তেওয়ারিদের আগমনে সনাতন হিন্দু ধর্মাচরনের অঙ্গন প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য যে অবিভক্ত নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ভেড়ামারা থানার রঘুনাথ বাড়ী মন্দিরের পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন বিহারের বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ তেওয়ারি। নিষ্ঠাভরে তিনি রঘুনাথের নিত্যসেবা দিতেন। কিন্তু দেশভাগের অভিঘাতে তিনি চলে আসতে বাধ্য হন করিমপুরের পাট্টাবুকা গ্রামে। বেশ কিছুকাল অবস্থান করার পর তার মনে অতীত জীবনের স্মৃতি বার বার উসকে উঠতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে পাট্টাবুকায় নিজ বাড়ির একটি অংশে স্থাপন করেন ছোট্ট ঠাকুর ঘর। ফুলিয়া থেকে নিয়ে আসা হয় রাম সীতার দারু বিগ্রহ। কুষ্টিয়ার ঐতিহ্য মেনেই শুরু হল নিত্য পূজা এবং বছরান্তে রথযাত্রা ও নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান। এর মধ্য দিয়ে বর্তমান করিমপুরের মূল ভূখণ্ডে প্রথম রাম সীতার পূজার সূচনা হলো।[৪২] বলা বাহুল্য যে এর বহু পূর্বে ধোড়াদহতে রাম পূজার প্রচলন হয়েছে।

সূচনা লগ্ন থেকে অদ্যবধি করিমপুরের ধর্মীয় সংস্কৃতি ক্রমেই স্ফীত হয়ে চলেছে। এই অঞ্চলে সুপ্রাচীন অতীতের হিন্দু ঐতিহ্য গুলির উপস্থিতির সাথে সাথেই সংযোজন ঘটেছে বহু নতুন ও বৈচিত্র্যময় উপাদানের। এ প্রসঙ্গে কাছারিপাড়ার শিব পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, চামনার বাসন্তি পূজা, কালি পূজা, লক্ষ্মী পূজা, হরেকৃষ্ণ পুরের বাসন্তী পূজা, বালিয়াডাঙ্গার এক রাতের কালীপূজা, ফুনকাতলার কালীপূজা, মানিকপুর ও মহিষবাথানের রাসযাত্রার মেলা, বিভিন্ন স্থানের রথের মেলা লক্ষ্মীপাড়া ও লক্ষ্মী পূজার মেলা প্রভৃতির কথা বলা যায়। ক্রমে শান্তি সাধুর কালী মন্দির, জোংড়াদহ কালী মন্দির, সেন পাড়ার কালী মন্দির সহ অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এসবের পাশাপাশি বহু হিন্দু ধর্ম গুরুর মন্দির বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলিকে কেন্দ্র করে

গুরুবাদী উপাসনারও প্রচলন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র প্রবর্তিত সৎসঙ্গের দুইটি মন্দিরের কথা বলা যায়। এছাড়া নিগমানন্দ সরস্বতীর মন্দির, অভয়পুরের পরমানন্দ মিশন, ধোড়াদহ'র ভারত সেবাশ্রম সংঘের অস্তিত্বের কথা বলা যায়। এই সকল প্রতিষ্ঠানে সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। তাছাড়া সারা করিমপুর ব্যাপি সারা বছর জুড়ে নামযজ্ঞ, পদ্মপুরাণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। স্ফীত হয়েছে গৌণ ধর্মচর্চার পরিসরও। উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী বাউল সাধকদের শিষ্য শাবক দের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে বাউল আখড়ার পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে গোড়ভাঙাতে মনসুর ফকির, আরমান ফকির, খৈবর ফকির দের আখড়া; গোয়াসে অর্জুন ক্ষ্যাপার আশ্রম; মজলিস পুরে আসমত ফকিরের আশ্রম; বাঁশবেড়িয়ায় রমেন দাসের আখড়া, প্রভৃতির কথা বলা যায়। আদিবাসীদের ধর্মচর্চা ও অনেক বিকশিত হয়েছে। কলাবেড়িয়াতে বসবাসকারী মালপাহাড়ি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী কুরিকুটি পূজা ও অন্যান্য উপাসনা করে। দহখুলা, আউদিয়া প্রভৃতি স্থানের ভূমিজরা টুসু পূজার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। এখানে চাঁই সম্প্রদায়ের আদিবাসীদেরও অবস্থান রয়েছে। এরা নিজেদের মতো করে বৈবাহিক ও পারলৌকিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। দেশভাগের পরে কেবলমাত্র রহমতপুরের মসজিদটি ছাড়া এই অঞ্চলের মুসলিম ধর্মচর্চায় কোন ক্ষতি সাধন হয়নি। বরং তা আরো বিস্তৃত হয়েছে। শিয়া ও সুন্নি- এই দুই ধরনের মুসলমান নিয়ে গড়ে উঠেছে মুসলমান সমাজ। সামান্য কিছু উৎসব ও আচরণের পার্থক্য ছাড়া এদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। উভয় শাখার মুসলমানদের নিয়েই গড়ে উঠেছে বহু নতুন নতুন মসজিদ। শুরু হয়েছে গ্রামে গ্রামে জলসা বা ইসলামী ধর্মসভার আয়োজন। বলা বাহুল্য যে এসবের ফলে পীরের উপাসনা অনেকাংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় থানার পাড়ার জঙ্গলী পীরের মেলা দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মও হয়েছে প্রসারিত মুরুটিয়া এবং আরবপুরে গড়ে উঠেছে আরও দুটি গির্জা। এখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় শাখারই খ্রিস্টানদের উপস্থিতি রয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে কোনও বিবাদ নেই। যাই হোক এ কথা সত্য যে করিমপুরে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করে। খুব ব্যতিক্রম ছাড়া এখানে সাম্প্রদায়িক হানাহানির দৃষ্টান্ত নেই। বরং সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য স্থাপনের দৃষ্টান্ত অনেক।

<u>করিমপুরের কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চিত্র</u>

মুরুটিয়ার জগন্নাথ মন্দির ও বিগ্রহ

কেচুয়াডাঙ্গার মসজিদ (নদিয়া জেলার প্রাচীনতম মসজিদ)

দেশভাগের স্মৃতি··· রহমতপুরের পরিত্যক্ত মসজিদ

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান, শিকারপুর, করিমপুর, নদিয়া

শান্তিরাজপুর চার্চ, শিকারপুর, করিমপুর, নদিয়া

করিমপুর দেবালয় ও শ্রী বিগ্রহ

সূত্র

[১] https://www.zpmeherpur.gov.bd/?page_id=230

[২] মল্লিক কুমুদনাথ, (২০০৭), *নদিয়া কাহিনী,* তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা পৃষ্ঠা ২৭৫

[৩]https://www.zpmeherpur.gov.bd/?page_id=230

[৪] বিশ্বাস সুজিত কুমার, *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ,* পৃষ্ঠা ৭৯

[৫] ইতিহাসের ছাত্র তথা সেনপাড়া নিবাসী অমৃত মণ্ডল প্রদত্ত তথ্য

[৬] রায় মোহিত (২০১৮) 'নদিয়ার মন্দির' (প্রবন্ধ), মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়ার সংস্কৃতি চর্চা,* অমর ভারতী,কলকাতা ,পৃষ্ঠা ১৮৩

[৭] ১৮/০৫/২০২৪ তারিখে গৃহীত দুর্বাদল দত্তের সাক্ষাৎকার

[৮] তদেব

[৯] বাগচী যতীন্দ্র মোহন, ‘পল্লীকথা’, কমল চৌধুরী (সম্পা), *নদীয়ার ইতিহাস,* দ্বিতীয় পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা ২৯৮

[১০] বিশ্বাস লোকেশ, ‘তেহট্ট মহকুমার পুরা সম্পদ’, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়ার সংস্কৃতি চর্চা,* অমরভারতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭৩

[১১] তদেব , পৃষ্ঠা ১৬৭

[১২] সরকার মিমি, *নির্বাচিত প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছ,* এবং অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ – মার্চ ২০২২, পৃষ্ঠা ২৬-৩১

[১৩] মৈত্র শ্যামল, ‘নদিয়া জেলার গ্রাম শহরের পূজা পার্বন ও মেলা’, তরুন ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক), *পশ্চিমবঙ্গ,* নদিয়া জেলা সংখ্যা, তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৪, পৃষ্ঠা-৯২

[১৪] বিশ্বাস লোকেশ, ‘তেহট্ট মহকুমার পুরা সম্পদ’, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়ার সংস্কৃতি চর্চা,* অমরভারতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৬৫

[১৫] বিশ্বাস লোকেশ, ‘তেহট্ট মহকুমার পুরা সম্পদ’, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়ার সংস্কৃতি চর্চা,* অমরভারতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৬

[১৭] তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৬

[১৮] তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৭

[১৯] বিশ্বাস সুজিত কুমার, *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ,* কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

[২০] বাগচী যতীন্দ্র মোহন, ‘পল্লীকথা’, কমল চৌধুরী (সম্পা), *নদীয়ার ইতিহাস,* দ্বিতীয় পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা ২৯৪

[২১] মল্লিক কুমুদনাথ, *নদীয়া কাহিনি,* মোহিত রায় (সম্পা), পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৫৯

[২২] বিশ্বাস লোকেশ, ‘তেহট্ট মহকুমার পুরা সম্পদ’, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়ার সংস্কৃতি চর্চা,* অমরভারতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭৩

[২৩] ২০/০৪/২০২৪ তারিখের ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৯৫০ সালে পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা নাটনা নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সাক্ষাৎকার

[২৪] হক এনামুল, *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব,* আনন্দ ভট্টাচার্য (সম্পা), বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৪৩৩

[২৫] বিশ্বাস লোকেশ, ‘তেহট্ট মহকুমার পুরা সম্পদ’, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়ার সংস্কৃতি চর্চা,* অমরভারতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭০

[২৬] সিংহ রায় সমিরেন্দ্রনাথন ‘নদিয়ার পূজা মেলা ও পার্বন’, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (সম্পা), *নদিয়া চর্চা,* অমরভারতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২৩

[২৭] ক্ষেত্রসমীক্ষা, মাজারের সেবাইত সুশান্ত চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার (২৮/০৯/২০২৩)

[২৮] বাগচী যতীন্দ্র মোহন, ‘পল্লীকথা’, কমল চৌধুরী (সম্পা), *নদীয়ার ইতিহাস,* দ্বিতীয় পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা ২৯৫

[২৯] https://dailynewsreel.in/shikarpur-church-feature/#google_vignette

[৩০] আচার্য প্রণব, নীল কুঠির সীমানা ছাড়িয়ে: শিকারপুর, প্রণব আচার্য, *শতবর্ষ স্মারক সাহিত্য,* শিকারপুর উচ্চ উচ্চত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিকারপুর, নদিয়া, পৃষ্ঠা-৪৪

[৩১] তদেব, ৪১

[৩২] ঝা শক্তিনাথ, *বস্তুবাদী বাউল,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৬৫

[৩৩] কেয়ামত সেখ ও হসেন সেখ কর্তৃক গৃহীত মুন্তাজ মণ্ডলের সাক্ষাৎকার

[৩৪] ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং ৩১/০১/২৪ ও ০১/০২/২৪ তারিখে গৃহীত কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল (বিশ্বাস) এর পুত্র রণজিৎ বিশ্বাস ও ভ্রাতা বিদ্বান বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার

[৩৫] ক্ষেত্রসমীক্ষা ও ৮/১২/২০২ তারিখে গৃহীত ভগীরথ সরকারের সাক্ষাৎকার

[৩৬] ক্ষেত্রসমীক্ষা ও ২০/০৪/২০২৩ তারিখে ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সাক্ষাৎকার

[৩৭] ক্ষেত্রসমীক্ষা ও ০৪/০১/২০২৪ তারিখে গৃহীত যমুনালাল পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার

[৩৮] ক্ষেত্রসমীক্ষা, সন্তোষ আগরওয়ালা ও তার পরিবারের সাক্ষাৎকার।

[৩৯] তদেব এবং যমুনালাল পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার

[৪০] ক্ষেত্রসমীক্ষা ও ০৫/০২/২০২৪ তারিখে গৃহীত রতন লাল জৈনের সাক্ষাৎকার

[৪১] তদেব

[৪২] ক্ষেত্র সমীক্ষা ও ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে গৃহীত সুপ্তি তেওয়ারি ও তাঁর পরিবারের সাক্ষাৎকার